দার্শনিক আলোচনা এবং রাজনৈতিক বাস্তববাদ:

বিশ্ব পশ্চিমা

বিংশ শতাব্দীর একটি উত্তরাধিকার

ডাঃ স্টেফান হোগেলের রচিত প্রবন্ধ

একজন দার্শনিকের আহ্বান

সফটওয়্যার-উৎপাদিত যাচাইবিহীন অনুবাদ

শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের প্রথম সংস্করণ

সূচিপত্র

সূচিপত্র

দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি: রাজনৈতিক বাস্তববাদ এবং বৈশ্বিক পশ্চিমা ৫

বিশ্ব পশ্চিমা: সার্বভৌমত্বের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি ৭

পশ্চিমের অক্ষমগুলি ১৮

উপসংহার: আগামী পঁচিশ বছরের জন্য তিনটি নীতিবাক্য ১৯

আমি চলে যাওয়ার পর ইতিহাস আমার সম্পর্কে যা-ই বলুক, আমি আশা করি তাতে লেখা থাকবে যে আমি আপনার সেরা আশাগুলোর প্রতি আবেদন করেছি, আপনার সবচেয়ে ভয়গুলোর প্রতি নয়; আপনার সন্দেহের পরিবর্তে আপনার বিশ্বাসের প্রতি। আমার স্বপ্ন হলো, আপনি সামনে এগিয়ে যাবেন মুক্তির প্রদীপ আপনার পদক্ষেপকে পথ দেখাবে এবং সুযোগের বাহু আপনার পথকে স্থির রাখবে।

রোনাল্ড রেগান (১৯১১-২০০৪)[1]

স্বাধীনতার বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

[1] *১৯৯২ সালের ১৭ই আগস্ট রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে দেওয়া এক ভাষণ থেকে। রোনাল্ড রেগান ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০তম রাষ্ট্রপতি এবং তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা মিখাইল গর্বাচেভের সঙ্গে একটি ব্যাপক ডিট্যান্ট প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।*

সন্দেহবাদীরা মূল্যবোধকে সমতুল্য ও উপকরণগত হিসেবে দেখে। রাষ্ট্রনায়করা ব্যবহারিক সিদ্ধান্তগুলো নৈতিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে নেন। .... আমার কাছে, বাস্তবনীতির (realpolitik) একটি যুক্তিসঙ্গত সংজ্ঞা হলো বলা যে এমন কিছু বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতি রয়েছে, যার ছাড়া বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করা যায় না। যে পরিস্থিতিগুলোর মোকাবিলা করতে হয়, সেগুলো না দেখে জাতিগুলোর ভাগ্য নিয়ে মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হলো পলায়নবাদ।[1]

হেনরি এ. কিসিনজার (১৯২৩-২০২৩)

দর্শন – ইতিহাস – রাজনীতি: রাজনৈতিক বাস্তববাদ এবং বৈশ্বিক পশ্চিমা

ঐতিহাসিক যুগের সমাপ্তিতে দর্শন, রাজনীতি এবং বিশ্ব ইতিহাসের এত নাটকীয়ভাবে জড়াজড়ি খুব কমই দেখা গেছে, যেমনটি ২০শ' শতাব্দীতে হয়েছিল, যার পরবর্তী প্রভাব আমরা আজও অনুভব করছি। তার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির এক চতুর্থাংশ শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও, এর উত্তরাধিকার প্রায়ই নজরে পড়ে না, এ কারণেই অসংখ্য রাজনৈতিক সংঘাত থামার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না। এটি বিশেষভাবে বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে স্পষ্ট, যেখানে অসংখ্য উত্তেজনা ও ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে। পরিস্থিতির জটিলতা এখন অনেক সমসাময়িককে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে, এবং একটি উন্নত ভবিষ্যতের পূর্ববর্তী আশা অনেক আগেই আত্মসমর্পণের অনুভূতির কাছে হার মেনেছে।

বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আমাদের এমন রাজনীতিবিদের প্রয়োজন যারা অসৎ আকাঙ্ক্ষায় পরিচালিত হন না, বরং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও প্রয়োজনীয় দূরদর্শন নিয়ে তাদের পদ প্রয়োগ করেন; অন্য কথায়, যারা *রিয়েলপলিটিক্স* বোঝেন। যদি, যেমন হেনরি কিসিনজার—যাঁকে *রিয়েলপলিটিক্স* রাজনীতিবিদের আদর্শ উদাহরণ মনে করা হয়—উপরের উদ্‌ধৃতিতে বলেছেন, এর অর্থ হয় বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া, তাহলে আমাদের এমন একজন নাবিকের প্রয়োজন, যিনি বর্তমান পরিস্থিতি, অর্থাৎ বাস্তবতার দ্বারা পরিচালিত হন।

[1] জার্নাল DER SPIEGEL (28/2009), ৫ই জুলাই ২০০৯ তারিখের একটি সাক্ষাৎকার থেকে।

নিঃসন্দেহে, যে কেউ বিপজ্জনক জলে জাহাজ চালাতে চায়, তাকে সবসময় অন্যান্য জাহাজ, নিজের সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য শত্রুদের সক্ষমতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। হালচালকারী প্রাসঙ্গিক হতে পারে এমন যেকোনো বিষয়ই খেয়াল রাখবে। তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো তথ্য, বাস্তব পরিস্থিতি: বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তার আদর্শবাদী মন, তবে, সমুদ্রের দিগন্তরেখার বাইরে তাকানোর সাহস রাখে – তার বুকের মধ্যে দুইটি আত্মা স্পন্দিত হয়[2] । ঝড়ো সমুদ্রেও এটি আশা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বীপ খুঁজে বেড়ায়। চাঁদের আলোয়, ক্যাপ্টেন শান্তি ও বন্ধুত্বের গান গুনগুন করেন, বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্তুতি যা তার হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু উত্তাল সমুদ্রের ঝড় সেই সূক্ষ্ম সুরগুলোকে ডুবিয়ে দেয়। আদর্শগুলো নক্ষত্রময় রাতের আকাশের এক ঝলকের মতো: কে জানে, সবাই কি কখনো তাতে একই বার্তা খুঁজে পাবে?

তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বের মধ্যে, উভয় পক্ষের মাঝে একটি তৃতীয় মাত্রা আবির্ভূত হয়েছে, যা অভিজ্ঞ নাবিকদের মনে রাখতে হবে: জলের গভীরে বিদ্যমান পরিস্থিতি—ঘূর্ণন ও স্রোত, যা সহজে দৃশ্যমান নয়, তবুও অনিবার্যভাবে উপস্থিত। এগুলো জলের প্রকাশ, এর মৌলিক গুণাবলীর, এবার বৃহৎ পরিসরে। নদী, হ্রদ ও সাগরে এর আচরণ বাস্তবতার অংশ এবং তাই নৌপরিচালনাকে প্রভাবিত করে।

গভীরতায় তাকানো মানে আসলে মানব প্রকৃতি, মানব *অবস্থাকে—conditio humana*—তাকানো। মানুষকেই এর মৌলিক উপাদান হিসেবে উপেক্ষা করে কীভাবে কেউ রাজনীতির সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারে? নিঃসন্দেহে, অস্তিত্বগত প্রশ্নগুলো প্রথমে দার্শনিক-ধর্মতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের দিকে ইঙ্গিত করে, প্রায়শই ব্যক্তিগত গুরুত্ব বহন করে। তবে শেষ পর্যন্ত, মানব প্রকৃতি একটি বৃহত্তর বিশ্বদর্শনে বোনা, যার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু যদি এই বাস্তবতার গভীরতা থেকে এমন স্রোত চিহ্নিত করা যায় যা একটি স্থির ধ্রুবক গঠন করে – এবং তাই বাস্তব?
একটি আদর্শবাদী তত্ত্ব দার্শনিক আলোচনার সন্ধান করবে শুধুমাত্র যাতে তা তার ভিত্তি হারায় না, কারণ সর্বদা সর্বোত্তমকে মাথায় রাখা উচিত। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তববাদকে মানব অবস্থার ওপর আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে: মৌলিক অস্তিত্বগত প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণাত্মকভাবে আলোচনা করার চেয়ে ব্যবহারিক পরিণতিগুলো হিসাব করার দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। শুধুমাত্র যখন বাস্তবতার সব দিক বিবেচনায় নেওয়া হয়, তখনই *প্রকৃত বাস্তবনীতি* কথা বলা যায়।

এই কাজটি এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি উৎসর্গীকৃত। *গ্লোবাল ওয়েস্ট* ২০শ শতাব্দীর ইতিহাসের সাথে এক বিশেষভাবে সংযুক্ত, যদিও এর শিকড় অতীতে

[2] কিসিঞ্জার: *"আদর্শবাদের একটি উপাদান ছাড়া বাস্তববাদ নেই।"*

অনেক দূরে বিস্তৃত। এর ভিত্তি মানব অবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এবং এর রাজনৈতিক, বিশেষ করে ভূ-রাজনৈতিক পরিণতি এমন এক যুগের পথ নির্দেশ করে যা এখনও পূর্বাভাস করা যায় না। ধারণাগত ও বিষয়বস্তুগত বিশ্লেষণ পশ্চিমা বিশ্বের মৌলিক স্বতঃসিদ্ধান্তে পৌঁছায় এবং সেই নীতিগুলো তালিকাভুক্ত করে যা *বাস্তব* বাস্তবনীতিকে ভবিষ্যতে মনে রাখতে হবে।

গ্লোবাল ওয়েস্ট
সার্বভৌমত্বের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি

সংঘাত ও বাগাড়ম্বর

রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি নতুন শব্দ প্রবেশ করেছে: *গ্লোবাল ওয়েস্ট*। এর আগে দুটি ধারণা জনপ্রিয় হয়েছিল, যা ২০শ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রচলিত হয়েছিল: *বিশ্বায়ন*, যা ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সংযোগ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বর্ণনা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, এবং *গ্লোবাল সাউথ*, উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য একটি বন্ধুসুলভ শব্দ।[3]

মিলেনিয়ামের পর থেকেই ধীরে ধীরে *'গ্লোবাল ওয়েস্ট ধারণাটি* আলোচনায় আসে এবং এখন এটি রাজনৈতিক, বিশেষ করে ভূ-রাজনৈতিক ভাষায় প্রবেশ করেছে। এটি সাধারণত সেই সব রাষ্ট্রকে বোঝায় যেগুলো একসময় *পশ্চিমা বিশ্ব* বা *পশ্চিমের* অংশ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ ছিল, যখন ২০শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্ব প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পশ্চিমা শিবিরে ছিল উদার গণতন্ত্র, শিল্পায়িত দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাংবিধানিক সরকার, যাদের বিরোধিতা করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রশক্তি পূর্ব শিবিরে। ইউরোপের বিভাজন শেষ হওয়ার পর দ্রুতই বৈশ্বিকীকরণের আলোচনা শুরু হয়, এবং তা শুধুমাত্র বৈশ্বিক বাণিজ্য সম্পর্কিত ছিল না। বিশ্ব যেন একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে, যেখানে গ্রহের সমস্যাগুলো এখন আরও ভালোভাবে সমাধান করা যাবে। জাতিসংঘের মতো

[3] যদিও উভয় শব্দই ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে দেখা যায়, ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত এগুলো মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হতো। একই কথা "গ্লোবাল নর্থ" শব্দটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সংস্থাগুলোর কাঠামোর মধ্যে চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল একটি 'বৈশ্বিক অভ্যন্তরীণ নীতি' প্রতিষ্ঠা করা[4] । এভাবেই ১৯৯০-এর দশক আপেক্ষিক উত্তেজনা প্রশমনের দশক হয়ে ওঠে।

এখন, কয়েক দশক পেরিয়ে, যখন মানুষ 'গ্লোবাল ওয়েস্ট' নিয়ে কথা বলে, তখন সাধারণত এটি স্বৈরতান্ত্রিক[5] এবং সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রগুলোর বক্তৃতাগত আক্রমণ। তারা একটি শক্তিশালী, বিশ্বব্যাপী সক্রিয় জোটের ছবি আঁকার চেষ্টা করে, যা অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাদের বিরোধিতা করে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলো, একটি অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত দেশসমূহের সমষ্টি, যাদের ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা থাকলেও যেকোনোভাবেই গ্লোবাল ওয়েস্টের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, বরং এর শিকার হিসেবে দেখা হয়। সন্দেহে পড়লে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো নিজেদের গ্লোবাল সাউথের অন্তর্ভুক্ত মনে করে বা অন্তত তার প্রতি সংহতি ঘোষণা করে।

এই কথিত বৈশ্বিক বিরোধিতা উত্তর-দক্ষিণ দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা ২০শ শতাব্দীতে শিল্পায়িত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্পর্ক বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হতো। বৈষম্য বর্ণনার পাশাপাশি, এই শর্তাবলীর জন্য দায়বদ্ধতার ওপরও সবসময়ই গুরুত্ব দেওয়া হতো, যা প্রায়শই শিল্পায়িত দেশগুলোর ওপর আরোপিত হতো।

যদি আজ শুধুমাত্র বৈশ্বিক সম্পদের বণ্টনই প্রশ্ন হতো, তাহলে "গ্লোবাল নর্থ" শব্দটি ব্যবহার করাই বেশি উপযুক্ত হতো, যদিও এই শব্দটিও সীমিত মাত্রায়ই প্রযোজ্য হতো। তবে, সাধারণ ব্যবহারে এর কোনো অস্তিত্ব নেই, ঠিক তেমনি "গ্লোবাল ইস্ট" এরও নেই, যা সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট-ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির জন্য একটি সমষ্টিগত শব্দ হিসেবে কাজ করতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে, এটি শুধুমাত্র সম্পদ নিয়েও নয়, কিংবা শীতল যুদ্ধ যুগের আদর্শগত অবশিষ্টাংশ নিয়েও নয়। অবশেষে, "গ্লোবাল সাউথ" একটি অদ্ভুত শব্দগুচ্ছ যা বক্তৃতামূলকভাবে দানবীয়ভাবে চিত্রিত পশ্চিমের বিপরীতে দাঁড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং তাই যতটা সম্ভব অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক: এটি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সেই অক্ষকে বোঝায়, যা গঠনগতভাবে একরকম না হলেও, পশ্চিমের থেকে নিজেদের পার্থক্য

[4] যদিও পদটি প্রথম ১৯৬৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানী ও দার্শনিক কার্ল ফ্রিডরিখ ফন ভাইজসেকার ব্যবহার করেছিলেন, এটি ইউরোপে গণতান্ত্রিক উত্থানের সময়ই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

[5] সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে, এই শব্দটি একটি সৌম্যবাক্য (euphemism) যা স্বৈরতান্ত্রিক লালন-পালনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে, তবে এটি শিশুদের প্রতি একটি নির্দিষ্ট স্নেহ এবং শ্রদ্ধাও প্রকাশ করতে পারে। ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকারকে পদদলিত করে এমন স্বৈরশাসনগুলির জন্য "স্বৈরতান্ত্রিক" শব্দটি ব্যাপক *রাজনৈতিক শুদ্ধতার* কারণে ব্যবহৃত হয়েছে, যা বিষয়বস্তুর দিক থেকে স্পষ্ট।

রক্ষা করে এবং প্রায়ই নিজেদেরকে একটি ভালো বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়।[6]

ভৌগোলিক অবস্থান ও ইতিহাস

আজকের পশ্চিমা রাজনৈতিকীকরণ থেকে অনেক দূরে, এর ধারণাগত উৎপত্তি মূলত ইউরোপকেন্দ্রিক মানচিত্রাঙ্কনে, যা অক্সিডেন্ট ও ওরিয়েন্ট নিয়ে আলোচনাকেও গড়ে তুলেছিল। ওরিয়েন্ট – উদীয়মান সূর্যের দেশ – এর বিপরীতে অক্সিডেন্ট, যেখানে সূর্য আবার অস্ত যায়[7] । পশ্চিম কি আটলান্টিক মহাসাগরে শেষ হয় নাকি—নতুন বিশ্বের আবিষ্কারের পর—যুক্তরাষ্ট্রে, তা মতের বিষয় হতে পারে, যেমন পূর্ব আরব উপদ্বীপে না দূরের জাপানে অবস্থিত—এটাও মতের বিষয়। শেষ পর্যন্ত, পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দুরই নিজস্ব এবং তাই আপেক্ষিক রেফারেন্স পয়েন্ট আছে, তাই এই প্রেক্ষাপটে 'পশ্চিম' নিয়ে আলোচনায় ঐতিহাসিক অর্থ নিহিত থাকে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের ধারায়, যা একসময় ভৌগোলিক পার্থক্য ছিল, তা এখন একটি আদর্শগত বিরোধিতায় পরিণত হয়েছে, যা এখন ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। তবে এর কারণ ও প্রবণতা এতটাই বৈচিত্র্যময় ও পরস্পরবিরোধী যে, মূল শত্রুতা বহুদিন আগেই এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।

প্রায়শই উল্লেখিত পশ্চিমের ধর্ম ও পূর্বের ধর্মের পার্থক্যও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করলে অনেক বেশি সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে।[8]

একটি বৈজ্ঞানিক পশ্চিম এবং একটি অ-উন্নত পূর্ব এর মধ্যে পার্থক্যও একইভাবে সীমিত। অঞ্চল এবং সাংস্কৃতিক বৃত্তের ওপর নির্ভর করে, এই বৈপর্য্য প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান ছিল এবং এখনও আছে, প্রায়শই যথেষ্ট তীক্ষ্ণতার সঙ্গে। তবে, এটি অন্যান্য মহাদেশ এবং সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঐতিহাসিকভাবে, বিভিন্ন আবিষ্কারের সূচনা হয়েছে পূর্বে, এবং দার্শনিক রচনাগুলো আরব-জয়কৃত স্পেনের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছেছিল, যা ১৬শ শতাব্দী থেকে উদীয়মান বিজ্ঞানগুলিতে নেতৃত্ব নিয়েছিল।

---

[6] কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পরিভাষাগুলোও প্রতিযোগিতার আওতায় পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন কর্তৃক ২০২১ সালে উদ্বোধনকৃত *"গণতন্ত্রের শীর্ষ সম্মেলন"*-এর জবাবে চীনা সরকার *"কার্যকর গণতন্ত্র"* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল।

[7] প্রাচীন গ্রিক *ἕσπερος / হেস্পেরোস* (সন্ধ্যা) এবং লাতিন *ভেস্পার* (সন্ধ্যা) ইন্দো-ইউরোপীয় মূল *wes- (সন্ধ্যা/রাত) থেকে উদ্ভূত।

[8] নিশ্চিতভাবেই, খ্রিস্টান-একত্ববাদী পশ্চিমকে সাধারণভাবে প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ পূর্ব-এর সাথে তুলনা করা যায় – ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং ভৌগোলিক সীমার মধ্যে। তবে, বিপরীত প্রবণতাগুলিকে উপেক্ষা করতে হবে, যেমন উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন মিশর, পারস্যে একত্ববাদী ধারা এবং পূর্বের ধর্মগুলি, তেমনি পশ্চিমা বিশ্বে বহুদেবতাবাদী ধারাগুলিকেও।

এই প্রেক্ষাপটে, জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার পূর্ব ও পশ্চিমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন এবং পশ্চিমে উচ্চমাত্রার যুক্তিবাদীকরণকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিবর্তে, নিরপেক্ষ মূল্য হিসাব-নিকাশ বাজার কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল – এবং এভাবে উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০শ শতাব্দীতে, পশ্চিমা শিল্পায়িত দেশগুলোর সাফল্য অনেক দেশের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে যারা এই পথে আধুনিকীকরণ করতে চেয়েছিল, অর্থাৎ তাদের সম্ভাবনা বিকাশ করতে[9] । অন্যদিকে, পূর্ব (এবং এর বাইরে) এর আপাতদৃষ্টিতে দূরবর্তী সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ইউরোপে দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে।
সব বিরোধপূর্ণ প্রবণতা ও উন্নয়নের মধ্যেও এক বিষয় স্পষ্ট: আজকের সংঘাতের মূল ভিত্তি ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য, স্থাপত্য, ভাষা বা রীতিনীতি নয়। এগুলো কিছু বৈপর্য্যকে সঙ্গ দিতে এবং চিত্রিত করতে পারে, তবে মূল শিকড় অনেক গভীরে এবং তা বহুদিন আগেই ভৌগোলিক সীমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এটি মানবতার অস্তিত্বগত প্রশ্ন এবং দর্শন দ্বারা প্রদত্ত উত্তরসমূহের বিষয়।

দর্শন ও রাজনীতি

আজ যখন আমরা দর্শনের প্রসূতিস্থান হিসেবে প্রাচীন গ্রিসকে চিহ্নিত করি, তখন আমরা জানি যে বিভিন্ন ধারণা ও চিন্তাধারা বহু সংস্কৃতিতে উদ্‌ভূত হয়েছে, হয়তো আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু কখনো লিপিবদ্ধ হয়নি। এই উন্নয়নগুলো তখনই ঐতিহাসিকভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন চিন্তার পথগুলো নিঃশব্দে শেষ না হয়ে সমাজে প্রবেশ করে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে।[10] এই দিক থেকে গ্রিক দার্শনিকরা একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি অর্জন করেছিলেন। বিশ্ব ও মানবজাতির অবস্থান সম্পর্কে তাদের চিন্তার ধারা তাদেরকে চিরতরে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছে। এখানেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়গুলির ঐতিহাসিক সূচনা, এখানেই *বৈশ্বিক পশ্চিমের* দার্শনিক ভিত্তি নিহিত, এবং এখানেই এর নামের উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া যায়।
গ্রীক দর্শন তখনই বিকশিত হয়েছিল যখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং পণ্যের প্রাণবন্ত বাণিজ্য একসঙ্গে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছিল যেখানে অস্তিত্বগত প্রশ্ন নিয়ে মুক্ত আলোচনা সম্ভব ছিল। হোমারের

[9] এই প্রেক্ষাপটে, 'উন্নয়নশীল দেশ' শব্দগুচ্ছটি প্রথমেই ভবিষ্যতের জন্য একটি আশা বহন করে; উন্নয়নের লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-দার্শনিক লক্ষ্যকে নির্দেশ করে।

[10] অনেক উন্নত সভ্যতায়—স্বতন্ত্রভাবে—দার্শনিক ধারণার ঐতিহ্য পাওয়া যায়। দার্শনিক কার্ল ইয়াসপার্সও প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ২০০ সাল পর্যন্ত সময়কে "অক্ষীয় যুগ" (Axial Age) হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কারণ এই কয়েক শতাব্দীতে চীন, ভারত ও পাশ্চাত্যে কেন্দ্রীয় দার্শনিক ভিত্তি প্রায় একই সময়ে উদ্‌ভূত হয়েছিল, একে অপরের সম্পর্কে না জেনে। (*ইতিহাসের উৎপত্তি ও লক্ষ্য*, ১৯৪৯, ২০)।

প্রচলিত কিংবদন্তিগুলো অতীতে বহু দূরে অবস্থান করছিল, এবং সাহসী চিন্তাবিদরা পুরনো প্রশ্নগুলোর নতুন উত্তর খুঁজছিলেন।

এই নতুন পথের প্রথম ধাপ হল প্রকৃতি ও তার প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা। প্রাথমিক পদার্থ ও মৌলিক উপাদানসমূহ সম্পর্কে প্রথম তত্ত্বগুলো আবির্ভূত হয়, তবে প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের অভাবে সেগুলো পরীক্ষা করা যায় না। তবে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র অনুমানের চেয়েও বেশি কিছু রয়ে যায়: মৌলিক সম্ভাবনাগুলো—অণু, মৌলিক উপাদান, প্রাথমিক নীতিমালা—এই যুগে, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের আড়াই হাজার বছর আগে, ইতিমধ্যেই রূপায়িত হতে শুরু করেছে।

গ্রিক দর্শনের দ্বিতীয় স্তম্ভটি মানুষের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে, যা একজন ব্যক্তি হিসেবে এবং সমাজে তার ভূমিকায় তাকে প্রভাবিত করে। এটি জ্ঞান, সঠিকভাবে জীবনযাপন এবং সম্প্রদায়ে সহাবস্থান সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নগুলো মোকাবিলা করে। তাই, সর্বাঙ্গীণ অর্থে, রাজনীতি[11] এবং নৈতিকতার প্রশ্নগুলোই এই আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করে। এখানেও এমন মডেল তৈরি করা হয়েছে যা আজকের আধুনিক তত্ত্বগুলোর ভিত্তি গঠন করে। সামগ্রিকভাবে, গ্রিক দর্শন এভাবেই *পশ্চিমা* সংস্কৃতির জন্য কেন্দ্রীয় বৌদ্ধিক ভিত্তি প্রদান করে।[12]

আরেকটি নতুন সূচনা আবিষ্কারের যুগের সূচনা ঘটাল। মধ্যযুগের শেষের দিকে, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য—যেমন প্রাচীন গ্রিসে—শহরগুলোর বিকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যাদের সম্পদ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নতিকে সম্ভব করেছিল। ইউরোপজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিয়ম উদঘাটন, অজানা অঞ্চল অন্বেষণ এবং বিশ্বজুড়ে নতুন পথ খুঁজে পাওয়া ক্রমশ সম্ভব হয়ে উঠল। গবেষণার সূচনা শীঘ্রই প্রযুক্তি, চিকিৎসা এবং দৈনন্দিন পণ্য উৎপাদনের সব ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করল – এমন এক উন্নয়ন যা আজও অব্যাহত রয়েছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার ফলসমূহ তখন থেকেই মানুষের জীবনকে গড়ে তুলেছে এবং *পশ্চিমা* জীবনধারার এক স্বাক্ষর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে গবেষণা ও বিজ্ঞান একটি সার্বজনীন ঘটনা। যদিও এগুলো ইউরোপীয়-পশ্চিমা সংস্কৃতিতে অগ্রগতি লাভ করেছে, তবুও ধারণা করা যায় যে তত্ত্ব ও অনুশীলনে বিশ্বের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি একদিন সারা বিশ্বে স্বাভাবিক বিষয় হয়ে উঠবে।

---

[11] এখানে *রাজনীতিকে* অ্যারিস্টটলের মতে ব্যাপক অর্থে বোঝা হয়, যিনি মানুষকে *zoon politikon* (সামাজিক সত্তা) হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

[12] এর সাথে যুক্ত হয়েছে রোমান আইনের নীতিসমূহ এবং ইউরোপে ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব। এই তিনটি উপাদানকে ইউরোপের গঠনমূলক স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রীক-রোমান প্রাচীনত্বের অবসান প্রায়ই ৫২৯ সালে এথেন্সে প্লেটোর একাডেমি বন্ধ হওয়ার সাথে যুক্ত, একই সময়ে মন্টেকাশিনোতে প্রথম বেনেডিক্টাইন মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় – যা খ্রিস্টান-প্রভাবিত ইউরোপীয় মধ্যযুগের জন্য একটি মাইলফলক।

তবে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং এর ফলসমূহ "পশ্চিমা পরিচয়"-এর শুধুমাত্র একটি অংশ। *পশ্চিমের* জন্য গঠনমূলক হলো মানুষদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে উপলব্ধি করা, যাদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অটুট অধিকার এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। যদিও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মূলত সার্বভৌমের - অর্থাৎ জনগণের - ইচ্ছার থেকে উদ্ভূত হয়, ব্যক্তির ব্যক্তিগত সার্বভৌমত্ব অটুট মানব মর্যাদা থেকে উদ্ভূত হয়।

মানব প্রকৃতি নিয়ে earliest প্রতিফলন থেকে শুরু করে গ্রিক দর্শন ও আলোকায়ন যুগ পেরিয়ে আজকের "পশ্চিমা" বোঝাপড়ায় পৌঁছতে দীর্ঘ যাত্রা হয়েছে, যেখানে অসংখ্য বিরোধ ও প্রতিবন্ধকতা ছিল। তবুও, শেষ পর্যন্ত, এই মানবতার চিত্রই স্বাধীনতা-ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলে। এমন একটি সমাজে, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত রাজনীতির গণতান্ত্রিক উত্স নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কাজ। কারণ বাস্তবে আইন ও বিধিমালা, আদালত ও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয়, একটি "পশ্চিমা" রাষ্ট্র শুধুমাত্র একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্র হিসেবেই থাকতে পারে, কোনো শিথিল ও অবাধ্য সম্প্রদায় হিসেবে নয়। ব্যক্তিদের সর্বদা তাদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষিত থাকবে বলে নির্ভর করার সুযোগ থাকতে হবে।

সার্বভৌমত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা: চূড়ান্ত ন্যায্যতা

পশ্চিমা বিশ্ব মানব মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের উল্লিখিত ধারণার উপর একটি দার্শনিক ধারণা হিসেবে, এবং একটি রাজনৈতিক, এমনকি ভূ-রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে নির্ভর করে[13] । মানবতার ধারণা – এবং এর চূড়ান্ত ন্যায্যতা – নির্ধারণ করে যে কোন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত। আমরা যেমন নিশ্চিত যে আমাদের মহাবিশ্বের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্বদর্শনই প্রাধান্য পাবে, ঠিক তেমনি আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এই ব্যবস্থাও সময়ের সাথে সাথে প্রাধান্য পাবে।

সবচেয়ে জনপ্রিয় আপত্তিটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে আসে এবং এটি নিম্নরূপ সংক্ষেপে বলা যায়: যেহেতু মহাবিশ্বের সমস্ত প্রক্রিয়া পদার্থগত নিয়ম অনুযায়ী ঘটে, তাই এটি সমস্ত পদার্থ, জীবজন্তু এবং মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হৃদস্পন্দন থেকে মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতম প্রক্রিয়া পর্যন্ত সবকিছুই প্রকৃতিতে সম্পূর্ণভাবে পদার্থগত এবং কারণ ও ফলাফলের একটি দীর্ঘ ও জটিল শৃঙ্খলের

[13] ব্যাখ্যা ও বোঝাপড়ার জন্য একটি ব্যাপক কাঠামো হিসেবে প্যারাদাইমের ধারণাটি এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যথার্থ বলে মনে হয়, কারণ বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক স্তরের (যেখান থেকে এটি মূলত উদ্ভূত – দেখুন থমাস কুহন, ১৯৬২) পাশাপাশি এটি অস্তিত্বগত, ব্যবহারিক এবং (ভূ)রাজনৈতিক ভিত্তিকেও স্পর্শ করে।

অংশ, যা জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি ঘড়ি-সদৃশ যান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো। মানুষের কাছে প্রকৃতির নিয়মের বাইরে কোনো সূক্ষ্ম আত্মা বা স্বাধীন ইচ্ছা নেই, এবং কোনো ধরনের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার আওতায় আসে না, তা বাস্তব নয়।[14]

যদিও এই "প্রাকৃতিকতাবাদী" বিশ্ববীক্ষা বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান সাফল্যের সাথে আরও বেশি অনুসারী লাভ করেছে, এর একটি মৌলিক ত্রুটি রয়েছে। যদিও এটি বারবার এমন ছাপ দেয় যে এটি একটি পদার্থগত থিসিস, বহু বছরের গবেষণার উপসংহার, তথাপি এর বিপরীতই সত্য। একটি পদার্থগত বিশ্ববীক্ষার পরিধির প্রশ্ন আর পদার্থগত কোনো প্রশ্ন নয়, বরং তা একটি দার্শনিক প্রশ্ন, এবং তাই এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে অবস্থান করে।

দার্শনিক আলোচনায়, যার ইঙ্গিত মাত্র এখানে দেওয়া হয়েছে[15] , যখন স্বাধীন ইচ্ছা ও মানব চেতনাকে স্নায়ুবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় হ্রাস করার বা নৈতিক প্রশ্নগুলোকে শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়, তখন গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। তবে, মানবতার একটি প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই নৈতিক ও নান্দনিক প্রশ্নগুলোকে অর্থহীন শূন্য ধারণা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে[16] , এবং ন্যায়বিচারের মানবিক অনুসন্ধান ও অর্থের অনুসন্ধানকে মস্তিষ্কের জটিল হ্যালুসিনেশন ও প্রক্ষেপণ হিসেবে বিবেচনা করে, যা নিজেই একটি অত্যন্ত জটিল যন্ত্র[17] , এবং শেষ পর্যন্ত জৈব-রাসায়নিক কারণগত সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত, যা জীবটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে মানুষের আত্ম-চিত্র তাই অবশ্যম্ভাবীভাবে ধরে নেয় যে, শারীরিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি একটি অতীন্দ্রিয় বাস্তবতা রয়েছে যা মানবাত্মা, মর্যাদা এবং স্বাধীনতার ভিত্তি প্রদান করে। ঘটনাক্রমে, এটি বিশ্বের শারীরিক গঠনকেও প্রযোজ্য করে, যার কারণগুলো আবার শারীরিক হতে পারে না। পরিশেষে, ভৌত বিশ্বের উৎপত্তি কোনো ভৌত তত্ত্ব নয়, বরং একটি মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন।

---

[14] ডেভিড লুইস: (১৯৮৩, ৩৬১): *"বিশ্ব ঠিক তেমনই যেমন* পদার্থবিজ্ঞান *বলে, আর বলার কিছু নেই।"* এই অবস্থানকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, যেমন পদার্থবাদ, ইতিবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ, তবে মূলত এটি সবসময় একই অনুমান থেকে এগিয়ে যায়।

[15] এই প্রবন্ধের একটি পৃথক প্রস্তাবনায় আরও কিছু ভাবনা পাওয়া যেতে পারে।

[16] *"যেখানে পজিটিভিষ্ট যুক্তি সবকিছু বাদ দিয়ে ক্ষেত্রটিকে একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ... সেখানে নৈতিকতা ও আইনের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানসূত্রগুলো বাদ পড়ে যায়"* – বেনেডিক্ট ষোড়শ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১-এ জার্মান বুন্ডেস্টাগে তার ভাষণে।

[17] এমনকি একটি সম্ভাব্য মিলও মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর প্রায়-প্রোগ্রামকৃত ধারাবাহিকতাকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে পারবে না, বরং কয়েকটি অনিশ্চিততা যোগ করে তা কেবল শিথিল করবে।

সারসংক্ষেপে, বলা যায় যে মানবজাতির মহান অস্তিত্বগত প্রশ্নগুলো, যেমনটি কাণ্ট সেগুলো ফর্মুলেট করেছিলেন[18] , পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যার পরিধি ছাড়িয়ে যায়।

অবশেষে, উল্লেখ করা উচিত যে প্রাকৃতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত অযৌক্তিক, কারণ সব মানুষ, এমনকি এর অনুসারী ও সমর্থকরাও, দৈনন্দিন জীবনে এমন আচরণ করে যেন তারা নিজেদের ইচ্ছায় নৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বা বিজ্ঞান চর্চা করছে এবং বিশ্বের রহস্য উন্মোচন করছে। আলোচনা যত বেশি জটিল হয়, ততই অযৌক্তিক মনে হয় যে শুধুমাত্র স্নায়ুবৈজ্ঞানিক প্রোগ্রামগুলোই আলোচনার গতিপথ ও পারস্পরিক ক্রিয়া নির্ধারণ করেছে।

এই পর্যায়ে নির্দিষ্ট কোনো দার্শনিক বা ধর্মীয় ধারণা নিয়ে আলোচনা না করেই বলা যায় যে, মানব মর্যাদা (এবং এর থেকে উদ্‌ভূত অধিকার ও কর্তব্য) নির্ধারণের জন্য বিশ্বের এমন এক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি প্রয়োজন, যা আরও অস্তিত্বগত প্রশ্নের জন্যও স্থান রাখে। "মানবতার পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি" – তবে শুধুমাত্র এটিই নয়[19] - অবশ্যম্ভাবীভাবে মানবতার এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাই সমগ্র বাস্তবতার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পূর্বধারণা করে।

অবশেষে, এটি উপলব্ধ একাধিক বিকল্প থেকে স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার মতো ইচ্ছাকৃত পছন্দের বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, উপলব্ধ বাস্তবতা কেবল একটিই, এবং এটি মানব নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এর প্রকৃতি যাই হোক—এবং এ নিয়ে বিতর্ক যতই তীব্র হোক—নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বাস্তবতাকে যেমন আছে তেমনই গ্রহণ করার ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই: বাস্তবতাই চূড়ান্ত বৈধতা, এটি সবকিছুর ঊর্ধ্বে: পরম সত্যের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বহুবিধ ব্যাঘাত: বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যে

প্রথম নজরে, উপরে বর্ণিত পশ্চিমের ধারণাটি বাস্তবতার চেয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইউটোপিয়ার জগৎ থেকে উদ্‌ভূত একটি অস্পষ্টভাবে গঠিত সমাজ মডেলের মতো মনে হয়। সমালোচনার মূল বিষয় তাই এই: যদি মর্যাদা, অধিকার ও সার্বভৌমত্বসম্পন্ন মানুষের উল্লিখিত ধারণাটি *প্রকৃতপক্ষে* তাদের প্রকৃতির সঙ্গে

---

[18] *"দর্শনের ক্ষেত্র [...] নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোতে সংকুচিত করা যায়: ১) আমি কী জানতে পারি? ২) আমি কী করা উচিত? ৩) আমি কী আশা করতে পারি? ৪) মানুষ কী?"* (*Critique of Pure Reason*, B833,1787) – ১৮৯৭/৯৮ সালে, ফরাসি চিত্রশিল্পী পল গগ্যাঁ একই ধরনের মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে একটি চিত্রকর্মের নাম দিয়েছিলেন: *"আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা কে? আমরা কোথায় যাচ্ছি?"*

[19] যে আদর্শবাদ ও বিজ্ঞানগুলো নতুন বিষয়ের সক্রিয় জ্ঞান, সংহতি বা মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও নান্দনিকতার কথা বলে, সেগুলোও অতীন্দ্রিয় রেফারেন্সের দিকে ইঙ্গিত করে। তাদের জন্য, এবং পশ্চিমা জীবনধারার অনেক প্রতিনিধির জন্য, এই সংযোগটি বেশিরভাগ সময় অজানা বা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বাস্তবে, অন্যথায় ব্যক্তি পূর্বনির্ধারিত ঘটনার এক শৃঙ্খলে নিজেকে হারিয়ে ফেলত এবং তথাকথিত আত্মা মনস্তাত্ত্বিক ভ্রান্তির এক স্থায়ী প্রবাহে ভেসে যেত। এতে বিজ্ঞানের দাবিগুলো হাস্যকর হয়ে উঠত এবং মানুষদের হাস্যকর পুতুলে পরিণত করত।

সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, এবং যদি এর ফলে উদ্‌ভূত মুক্ত সামাজিক ব্যবস্থাটিই উপযুক্ত ধারণা হয়, তাহলে কেন তা ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং এতবার টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে?
প্রথম দৃষ্টিতে, এই আপত্তি যৌক্তিক মনে হয়; প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাস এবং বর্তমান সময়কে দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে বিজ্ঞানের পথ তুলনামূলকভাবে সরল হয়েছে, ধর্ম ও রাজনীতি দ্বারা কেবল মাঝে মাঝে প্রভাবিত, সেখানে একটি কার্যকর সমাজব্যবস্থার অনুসন্ধান পরিবর্তনশীল এবং কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। কেন এই পথ এত পাথুরে?
উত্তরটি বিভিন্ন ফাঁক, প্রতিঘাত, ধারাবাহিকতা এবং বিপরীত প্রবণতায় নিহিত, যেগুলোকে সাধারণভাবে বিঘ্ন হিসেবে সংক্ষেপে বলা যায়। এগুলোর বিভিন্ন স্থান-কালগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা রয়েছে এবং এগুলো একে অপরকে শক্তিশালী করতে পারে।

- অস্থায়ী ব্যাঘাত: যদিও সমস্ত সংস্কৃতিতেই উদার সংবিধানিক রাষ্ট্রের সূচনা খুঁজে পাওয়া যায়, তবুও উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন গ্রিসে প্রাথমিক প্রচেষ্টার পরেও এমন একটি রাষ্ট্রের বিকাশ তুলনামূলকভাবে আধুনিক একটি উন্নয়ন, যা জনগণের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন পায়নি। ১৯শ ও ২০শ শতাব্দী পর্যন্ত, যখন নাগরিকরা নিজেদের ক্ষমতায়ন ও সার্বভৌমত্ব আবিষ্কার করল, তখনই মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ধারণাটি গ্রহণযোগ্যতা পেল – যদিও এর পথে সুপরিচিত বাধা ও প্রতিঘাত ছিল।

- স্থানীয় বিঘ্নতা: যদিও পশ্চিমা মূল্যবোধ বিশ্বের এক অংশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে, অন্যত্র ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থাগুলো তাদের মর্যাদা ধরে রেখেছে। এটি হতে পারে নিজের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের কারণে, যার ফলে নিজের পরিপক্কতা সম্পর্কে আলোকিততার অভাব দেখা যায়। একই সময়ে, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় শক্তিগুলো এই স্বাভাবিক উন্নয়নকে ধীর করে দিচ্ছে।

- ক্রমবিন্যাসগত ব্যাঘাত: যদিও নিজের সার্বভৌমত্বের সচেতনতা মানব অস্তিত্বের গঠনমূলক উপাদান, ইতিহাস বারবার দেখেছে পুনরুদ্ধারমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের আবির্ভাব, যা একসময় এত কষ্টসাধ্যভাবে অর্জিত মূল্যবোধগুলোকে ' ' প্রশ্নবিদ্ধ করে। যদিও পশ্চিমা মূল্যবোধ—এবং এর সঙ্গে আসা সমৃদ্ধি—বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ অর্জন করেছে, তবুও ঐতিহাসিক উন্নয়ন কোনোভাবেই স্বয়ংক্রিয় নয়। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে

বড় প্রতিঘাত ছিল ইউরোপে ফ্যাসিবাদের যুগ, বিশেষ করে জার্মানির জাতীয় সমাজতন্ত্র।[20]

- ব্যক্তিগত বিঘ্নতা: উদার গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য বিভিন্ন স্তরে হ্রাস পেতে পারে এবং সাধারণ নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেই এর বিপরীতে পরিণত হতে পারে। সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উন্নয়নে অসন্তোষও মানব সহাবস্থানের সবচেয়ে মৌলিক স্তম্ভগুলো পরিত্যাগ করার কারণ হতে পারে, যা সর্বদা সাধারণ সামাজিক পশ্চাদপসরণের ঝুঁকির সঙ্গে থাকে।

- সাংস্কৃতিক বিঘ্নতা: যেসব সমাজ নিজেদের মুক্ত ও গণতান্ত্রিক মনে করে, তাদের দিকে এক নজর ফেললেই দেখা যায় যে জাতীয় সীমানার মধ্যেও রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে কোন মৌলিক মূল্যবোধগুলো থাকা উচিত তা নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। এটি ব্যক্তিগত আইন ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার বিষয় নয়, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারণ করা হয়, বরং এটি নৈতিকতা, রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মৌলিক প্রশ্ন। দেশভেদেও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ধারণায় কমবেশি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।[21]

- কৌশলগত বিঘ্নতা: বিস্তৃত ও স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে মুক্ত বিশ্বকে রক্ষা করা এবং নিজস্ব অস্তিত্ব—সৈন্যঘাঁটি, কাঁচামাল, মিত্রশক্তি—নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা বারবার এমন রাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত জোট গড়তে বাধ্য করে, যাদের অভ্যন্তরীণ সংবিধান নিজস্ব মূল্যবোধের পরিপন্থী। নৈতিক দ্বিধা স্পষ্ট এবং এটি নাগরিক ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিপজ্জনক উদাসীনতার সৃষ্টি করতে পারে।[22] এটি সমতার ছাপ এবং বৈধ স্থায়ী সহাবস্থানের ধারণা তৈরি করতে পারে।

---

[20] সমাজবিজ্ঞানী ইউর্গেন হ্যাবারমাস যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে শুরু হওয়া গণতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসকে বর্ণনা করেছেন একটি *"অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, এবং পরবর্তীতে কিছুটা সাংস্কৃতিক, প্রক্রিয়া* হিসেবে *যা [শুধুমাত্র] তখনই অপরিবর্তনীয় হয়ে উঠবে যখন সাংস্কৃতিক পশ্চিমীকরণ সমগ্র জনগোষ্ঠীর মানসিকতায় ছড়িয়ে পড়বে"* (জুলাই ১৯৮৯ সালে বারবারা ফ্রেইটাগের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে)।

[21] অবশ্যই, একটি সমাজের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রকৃত উপলব্ধি মধ্যবিত্ত, গড় আয়ের, বাস্তববাদী মধ্যবয়স্কদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। বরং, প্রকৃত মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় তরুণদের অবস্থা, প্রবীণ নাগরিকদের অবস্থা এবং সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর অবস্থার মধ্যে, তেমনি কারাগার, সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের শর্তেও, যা ব্যক্তিগত সার্বভৌমত্বকে প্রভাবিত করতে পারে।

[22] কৌশলগত নীতি *"আমার শত্রুর শত্রুই আমার বন্ধু"*, যা সহস্রাব্দ ধরে পরিচিত, অস্তিত্বসংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে কৌশলগতভাবে ন্যায্য হতে পারে, তবে এটি (ক্ষমতার) রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের নৈতিক ভিত্তিকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না।

যদি কেউ আইন শাসনের ভিত্তিতে উদার ও গণতান্ত্রিক নীতিগুলির আবিষ্কার ও বাস্তবায়নকে সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন পূর্বশর্তসহ একটি ধাপে ধাপে বিকশিত প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝে, তাহলে শুরু থেকেই এ ধরনের পার্থক্য প্রত্যাশা করা উচিত। যদিও ইতিহাসে স্বৈরশাসন থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তরের জন্য বারবার বিপ্লবী আন্দোলন হয়েছে, তবুও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি প্রকৃতিগতভাবে বিবর্তনীয়।

ভূ-রাজনীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি

যদি উপরের মানবতার ধারণাটি, যা অতীন্দ্রিয়তার প্রতি উন্মুক্ত একটি বিশ্বদর্শনের কাঠামোর মধ্যে সংজ্ঞায়িত, প্রকৃত বাস্তবতার সাথে খাপ খায়, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদে উদার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা ইতিহাসজুড়ে প্রাধান্য বিস্তার করবে। এই পর্যবেক্ষণটি ২০শ শতাব্দীতেই করা যেত, যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল যে ব্যক্তিগত মর্যাদা ও স্বাধীনতা কেবল একটি দার্শনিক ধারণার ফল নয়, বরং বিশ্বের সর্বত্র বহু মানুষের চেতনার প্রতিফলন।[23] প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯০-এর দশকে অসংখ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও শান্তি উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, যা কিছু গবেষককে "গ্লোবাল অভ্যন্তরীণ নীতি"[24] এর আবির্ভাবের পূর্বাভাস দিতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, যা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বগুলো সমাধান করবে।

তবে ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, রাষ্ট্রসমূহের একটি সম্প্রদায়ের ছবি—যা নিজস্ব গতি ও শর্তে গণতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—একটি বিপরীত বাস্তবতা দ্বারা ছাপিয়ে গেছে। কারণ 'স্বাধীন বিশ্ব'[25] এর রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি এমন কিছু স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রয়েছে এবং অতীতেও ছিল, যাদের প্রধান লক্ষ্য ক্ষমতা ধরে রাখা বা কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ বাস্তবায়ন করা এবং যারা প্রয়োজন হলে ঐক্যবদ্ধভাবে পশ্চিমা বিশ্বকে বিরোধিতা করে। তারা গোপনে সন্দেহ করতে পারে যে শীঘ্রই বা দেরিতে স্বাধীনতার কোনো পথ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তারা এই উপলব্ধি এবং এর ফলে উদ্‌ভূত পরিণতিগুলোকে প্রতিরোধ করে। শেষ পর্যন্ত, তারা এমন এক বাস্তবতাকে প্রতিরোধ করছে যা প্রতিরোধ করা অসম্ভব।

বিপরীত নীতিসমূহ: "দুইটি বিশ্ব"

---

[23] দার্শনিক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ১৯৮৯ সালে 'ইতিহাসের সমাপ্তি'র কথা বলেছিলেন, যখন বিশ্বজুড়ে মানুষ তাদের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব দাবি করেছিল এবং এটি একটি সার্বজনীন দাবি হিসেবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

[24] পাদটীকা ৪ দেখুন।

[25] এই বিকল্প পরিভাষাটিও ঐতিহাসিকভাবে ভারাক্রান্ত – পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের পর থেকেই।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে[26] , স্বৈরতান্ত্রিক ও মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব রয়েছে, যা স্বভাবতই মৌলিকভাবে অসমমিত। এর কারণ সামাজিক সহাবস্থানের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে নিহিত।

গণতান্ত্রিক বিশ্বে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের স্বার্থে বিদ্যমান। এর একমাত্র ন্যায্যতা হল মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে সক্ষম করা এবং যতদূর সম্ভব তাদের সার্বভৌম জীবনধারায় কোনো হস্তক্ষেপ রোধ করা। একটি মুক্ত সমাজে, রাষ্ট্রকে তার কর্মকাণ্ডের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হয় এবং দেখাতে হয় যে আরও কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োজনীয় এবং বিকল্পহীন। নাগরিককে তার স্বাধীনতার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হয় না, বরং রাষ্ট্রকেই তার হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হয়।

স্বৈরতান্ত্রিক ও সর্বাত্মক রাষ্ট্রগুলোতে এই নীতি উল্টে যায়: রাষ্ট্র এবং এর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সার্বভৌম, তা ধর্মীয়, রাজনৈতিক-মতাদর্শগত বা ব্যক্তিগত যেকোনো ভিত্তিতেই হোক। ব্যক্তি, যতদূর এ ধরনের কোনো কিছুর কথা বলা যায়, প্রতিটি দিক থেকেই এই রাষ্ট্রনীতির অধীন। অবশ্যই, এখানে ধাপে ধাপে পার্থক্য রয়েছে: "নরম" স্বৈরশাসন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ নাও করতে পারে এবং শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমালোচনাকারীদেরই হয়রানি করতে পারে, অন্যদিকে সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং তাদের অস্তিত্বকেই ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তবে শেষ পর্যন্ত, ব্যক্তি শাসক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসহায়; সে কোনো অধিকার বা মর্যাদা দাবি করতে পারে না, তার কর্মের স্বাধীনতা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুদানের মতো এবং যে কোনো সময় তা সীমিত বা বাতিল করা যেতে পারে। একটি অস্তিত্বগত ঝুঁকি তাদের পুরো জীবন জুড়ে থাকে এবং সামাজিক সহাবস্থানকে—এবং কখনও কখনও ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বকেও—সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম বিবরণ পর্যন্ত বিকৃত করে। raison d'état—অর্থাৎ শাসনব্যবস্থার টিকে থাকা—মানব অস্তিত্বের সব ক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করে এবং প্রভাব ফেলে।[27]

আন্তর্জাতিক স্তর

এই স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর অগ্রাধিকার আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রতিফলিত হয়: সমস্ত প্রচেষ্টা শাসক শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব ও ক্ষমতা নিশ্চিত করার দিকে পরিচালিত হয়, এবং অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক বা আদর্শগত উদ্দেশ্যকে এই প্রচেষ্টার অধীনে রাখা হয়। যেহেতু ক্ষমতা ধরে রাখার প্রাধান্য ইতিমধ্যেই

[26] এই রূপক শব্দটি একটি নাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন ও মর্যাদা হারায় এবং কোটি কোটি মানুষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়, তাই এটি নিষ্ঠুর মনে হয়। সম্পদের ধ্বংস বিশ্বব্যাপী পর্যায়ে ঘটছে এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সবার ওপরই এর ছাপ পড়ে।

[27] বাস্তবে, এই শব্দগুলো শ্রম ও নির্মূল শিবির, নির্যাতন কেন্দ্র, নিপীড়ন এবং অকল্পনীয় মাত্রার নৃশংসতার দিকে ইঙ্গিত করে: এগুলোই গভীরতম অস্তিত্বগত গহ্বর।

মানবাধিকার এবং পরিবেশগত বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সংকুচিত, উপেক্ষিত বা অভ্যন্তরীণভাবে দমন করে, তাই এই মূল্যবোধগুলো একনায়কত্বের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কোনো গুরুত্ব পায় না—শুধুমাত্র শাসনব্যবস্থার প্রকৃত বা অনুমানকৃত হুমকির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রচারের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য তাত্ক্ষণিক বিপদ আসে তাদের সমকক্ষদের কাছ থেকেই: কারণ তারা তাদের নাগরিকদের সার্বভৌমত্বকেও সম্মান করে না, অন্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বকেও সম্মান করে না, তাই পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই: শক্তিই মূলনীতি – বাহ্যিক সহিংসতা সব সময়ই শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জঙ্গল আইন প্রযোজ্য – টিকে থাকতে সামরিক শক্তি অপরিহার্য। অবিশ্বাসের পরিবেশে জোট প্রায়ই অনিশ্চিত হয় এবং নিজের অস্তিত্ব সর্বদা ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

দমনমূলক শাসনব্যবস্থার জন্য একটি মৌলিক – অভ্যন্তরীণ – বিপদ হল তাদেরই নাগরিকরা, যারা তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং তাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অধিকার দাবি করতে পারে। যদিও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো নীতিগতভাবে নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়ায় এবং আন্তর্জাতিকভাবে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে, তারা সাধারণত তাদের কার্যক্রম সংহতি প্রকাশ ও প্রস্তাবনায় সীমাবদ্ধ রাখে। সক্রিয় সহায়তা, যার মধ্যে বলপ্রয়োগমূলক হস্তক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত, শুধুমাত্র চরম ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই আশা করা যায়।

যদিও মুক্ত বিশ্ব স্বৈরশাসনগুলোর সামরিক আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য জোট গঠন করতে পারে, নির্যাতিত জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসার সুযোগগুলো সীমিতই থেকে যায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সাধারণত সামরিক শক্তি বা রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকে কারণ তারা আলোচনা, বোঝাপড়া এবং সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। উপরন্তু, সবসময়ই এই ঝুঁকি থাকে যে বিদেশী হস্তক্ষেপ জনগণের কাছে সন্দেহের চোখে দেখা হবে, যা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করবে। প্রতিটি নতুন নির্বাচনের সাথে, রাজনৈতিক মনোভাব পরিবর্তনের এবং এমনকি ঐতিহাসিক জোটগুলোও শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পরিবর্তনের প্রতি উন্মুক্ততা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সার্বভৌম নাগরিকদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীলতা মুক্ত সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য। একই সাথে, এই স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর অক্ষের জন্য একটি খোলা দুর্বল দিক উপস্থাপন করে।

অতএব তারা সর্বস্তরে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে জনমত ও ভোটার আচরণকে প্রভাবিত করার এবং নিয়ন্ত্রিত সংকটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সমাজকে চ্যালেঞ্জ জানানোর চেষ্টা করে। এর উপায়গুলির মধ্যে রয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো থেকে শুরু করে বাহ্যিক সীমান্তে অভিবাসন চাপ তৈরি করা, সামরিক

উসকানি ও হামলা পর্যন্ত। এর সাথে যোগ হয় স্বৈরশাসকীয় অক্ষের বিরোধিতা করা ব্যক্তি নাগরিক ও সংগঠনগুলোর ওপর অবিরাম চাপ, যা তাদের মিডিয়া বা শারীরিক সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু করে তোলে। শেষ পর্যন্ত, লক্ষ্য হলো সব স্তরে বিস্তৃত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে অস্থিতিশীল করে তোলা, যাতে তারা বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা রক্ষা ও প্রচারের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসে।

রাজনীতিবিদদের মধ্যেও ক্ষমতার এই উপাদান ও প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা যথেষ্ট সীমিত। স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্ভাব্য গণতান্ত্রিক উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাস রাজনৈতিক পরিস্থিতি নির্মমভাবে বিশ্লেষণ করার তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয়।[28] এছাড়াও, মুক্ত বিশ্বের নীতিসমূহ – *গ্লোবাল ওয়েস্ট* – বারবার ভুলভাবে বোঝা হয় এবং দুর্বল করে ফেলা হয়।

পশ্চিমা মূলসূত্রসমূহ

ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় মতাদর্শের তুলনায়, পশ্চিমা বিশ্বকে সংযমের এক মাত্রা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়: এতে অনুপস্থিত রয়েছে শেষবিচার-সংক্রান্ত নমুনা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দৃশ্যকল্প এবং ইউটোপীয় সামাজিক মডেল। স্বাধীনতা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের প্রতিশ্রুতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিষয়বস্তুহীন বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি কয়েকটি মৌলিক দিক ও কাঠামো সম্পর্কে[29] । পশ্চিমের স্বাধীনতার একটি অক্ষীয় মাত্রাও রয়েছে:

১. পরম সার্বভৌমত্ব: উন্মুক্ত-অতীন্দ্রিয় ভিত্তি

[28] শীতল যুদ্ধের সময় তথাকথিত "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" উল্লেখটি প্রতারণামূলক, কারণ একই সময়ে সংঘটিত সংঘাতগুলো বিবেচনায় নিলে তা সত্য নয়। যদিও পরাশক্তিগুলোর মধ্যে পারমাণবিক অচলাবস্থা সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ অসম্ভব করে তুলেছিল, প্রকৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিবর্তন এবং পূর্ব ইউরোপে উত্থানের পরেই। এই ধরনের জোরপূর্বক সহাবস্থান তাই শুধুমাত্র অস্থায়ী হতে পারে, ঠিক তেমনি অস্থায়ী যেমন এক স্বৈরাচারী সরকার এবং তার নিপীড়িত নাগরিকদের মধ্যে জোরপূর্বক অভ্যন্তরীণ সহাবস্থান।

[29] এটি এমন কোনো প্রশাসনিক কাঠামোকে বোঝায় না যা একটি মুক্ত সাংবিধানিক রাষ্ট্রে, তার সমস্ত সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে, সম্পূর্ণরূপে কল্পনাযোগ্য; বরং এটি মানুষের আদর্শগত 'প্রোগ্রামিং' পরিত্যাগের কথা বলে।

বাস্তবতার এই দৃষ্টিভঙ্গি মানব প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড বোঝার জন্য একটি প্রয়োজনীয় ভিত্তি। শুধুমাত্র এই ভিত্তিতেই বিভিন্ন আদর্শগত ও ধর্মীয় রেফারেন্সের সাথে আরও অস্তিত্বগত দিকগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। আদর্শগত কোনো বাধা ছাড়াই মুক্ত ও উন্মুক্ত আলোচনা পশ্চিমা বিশ্বের একটি অপরিহার্য মূল।

২. ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব: নিজের জীবন গঠনের অধিকার

মানব প্রকৃতি ও মর্যাদা বাস্তবতার এক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে। মানবতার এই দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিক মানবাধিকারের উদ্ভব ঘটায়, যা ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব জীবন গড়ার সার্বভৌম অধিকার নিশ্চিত করে। মানব অস্তিত্বের এই অস্তিত্ববাদী মূল ভিত্তি মৌলিকভাবে প্রশ্নাতীত: ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব অটুট, এমনকি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তেও।

৩. জনগণের সার্বভৌমত্ব: সমাজ তার নিজস্ব স্বার্থে নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়

সমাজের রাজনৈতিক নিয়মাবলীর গণতান্ত্রিক উৎস থাকা উচিত, অর্থাৎ সেগুলি নির্বাচন ও গণভোটের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। সমাজের বিকাশ মৌলিকভাবে উন্মুক্ত। জনপ্রভুত্ব রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যক্তির সার্বভৌমত্বকে প্রতিফলিত করে – উভয় সার্বভৌমত্বই আন্তঃনির্ভরশীল: যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বিকশিত হয়, তেমনি গণতন্ত্র রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক - এবং তাই স্বাধীন - নাগরিকদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

৪. স্বার্থের সংগঠনের পরিবর্তে মূল্যবোধের মাধ্যমে সংহতি

স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলির বিপরীতে, যারা বিরোধপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে নিজেদের মৈত্রী করেছে, পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি একটি অতীন্দ্রিয় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে মূল্যবোধ এবং মর্যাদা আলোচ্য নয় বরং একটি গভীর বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা এবং -এ নিহিত, অতএব তা প্রকৃতপক্ষে প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, এই দার্শনিক পার্থক্য পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে এমন এক সংহতির দিকে নিয়ে যেতে হবে যা সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক মতবিরোধের মুখেও কখনোই প্রশ্নবিদ্ধ হবে না। এতে স্বৈরশাসনবাদের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়ানোও অন্তর্ভুক্ত।

৫. ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি: সার্বজনীন পশ্চিম

গ্লোবাল ওয়েস্টের প্রকল্প একটি সার্বজনীন প্রকল্প, যা স্বৈরশাসিত রাষ্ট্রগুলোর সাথে শুধুমাত্র একটি রূপান্তরকালীন ভিত্তিতে সহাবস্থানকে নৈতিকভাবে ন্যায্যতা দিতে পারে। যদি কেউ সমস্ত সমাজের ভিত্তি হিসেবে সার্বজনীন মানব মর্যাদা ও অধিকারকে বৈধ বলে গ্রহণ করে, তাহলে সেগুলোকে উপেক্ষা করা একটি অশুভতা, যা অবশ্যই পরাভূত করতে হবে। স্বৈরশাসিত ব্যবস্থাগুলো *স্বভাবগতভাবে* টেকসই অস্তিত্বের অযোগ্য এবং তাই তাদের অস্তিত্ব সীমিত, এ কারণেই সার্বজনীন পশ্চিমা[30] পশ্চিমা জাতির সারমর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার অভাব—অবশেষে বাস্তবতার দার্শনিক ভিত্তির সঙ্গে তাদের বিরোধের কারণে—*স্বৈরশাসনগুলো, সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে, পারস্পরিকতার অভাবে সীমিত সার্বভৌমত্বই ভোগ করে।*[31]

বাস্তব রিয়েলপলিটিক্স, অর্থাৎ এমন একটি রাজনৈতিক অবস্থান যা সর্বদা ভূ-কৌশলগত পরিস্থিতির পাশাপাশি *মানবিক অবস্থাকে* কর্মের ভিত্তি হিসেবে দেখে, কখনোই এই সংযোগগুলো ভুলে যেতে পারে না। অতএব, এটি কেবল এখানে পশ্চিমের অক্ষম হিসেবে উপস্থাপিত ভিত্তিগুলোর ওপরই বিকশিত হতে পারে, ভবিষ্যতে এগুলোকে যাই বলা হোক না কেন।

উপসংহার: আসন্ন পঁচিশ বছরের জন্য তিনটি নীতিবাক্য

পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের অবসান পরবর্তী আশাব্যঞ্জক প্রথম কয়েক বছর, যা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি কোণে অন্তত সাময়িক আলো ছড়িয়েছিল, তার পর থেকে সহস্রাব্দের শুরু থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বহু অঞ্চলে অন্ধকারময় হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, গত শতাব্দীর সিস্টেমিক দ্বন্দ্ব পরিবর্তিত রূপে ফিরে এসেছে: দমনমূলক শাসনব্যবস্থার একটি অক্ষ, স্বৈরতান্ত্রিক বা উদাসীন রাষ্ট্রের একটি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত, মুক্ত বিশ্বের বিরুদ্ধে একটি প্রতি-আন্দোলন গড়ে তোলা এবং ধীরে ধীরে তা উৎখাত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

এই ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের মুখে, গ্লোবাল ওয়েস্ট দীর্ঘদিন ধরে প্রতিরক্ষামূলক কৌশল অনুসরণ করেছে এবং সামরিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তিতে স্বৈরতান্ত্রিক ঢেউয়ের ক্রমবর্ধমান বিপদকে উপেক্ষা করেছে। ক্ষয়ের দুই দিক রয়েছে: একদিকে, কয়েকটি রাষ্ট্রে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, অন্যদিকে,

---

[30] ১৯৯০-এর দশকের অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্বায়নের তুলনায়, যা আমরা এখন দেখছি তা হল দার্শনিক ভিত্তিক বিশ্বদর্শনের প্রেক্ষাপটে মানব মর্যাদার বিশ্বায়ন। এটি মোটেই এমন একরকম সংস্কৃতির কথা নয় যার আড়ালে মানবতার জাতিগত বৈচিত্র্য বিলীন হয়ে যাবে।

[31] অসাধারণ পরিস্থিতিতে, যেমন একনায়কত্বের পতনের ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরেও একটি সরকারের বৈধতা অস্থায়ীভাবে উদ্ভূত হতে পারে। তবে যেকোনো পরিস্থিতিতেই এবং সর্বদা ব্যক্তির সার্বভৌমত্বকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পারস্পরিক সহযোগিতা – যার মধ্যে সামরিক সংহতিও রয়েছে – মারাত্মক বিপদে রয়েছে।
এই ঐতিহাসিক পরীক্ষায় উদার আন্দোলনের ভিত্তিতে মৌলিক প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন, তবে তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন এই বিশ্বাসে যে, দমনকারী আগ্রাসীর হুমকির মুখে পড়া একটি মুক্ত সমাজ লড়াই ছাড়া আত্মসমর্পণ করবে না। স্বাধীনতার শক্তি রাজনৈতিক ছলচাতুর্য ও সামরিক দমনের বাইরেও গভীর শিকড় বিস্তার করেছে: ইতিহাস প্রমাণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রমাণ করবে যে, এটি শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। মুক্ত বিশ্বের ধারণা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তবে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলো এটিকে দমিয়ে রাখার কারণে নয়, বরং এর প্রয়োজনীয় পরিপূরক—দমনমূলক ঢেউ—আশা করা যায় খুব শীঘ্রই থেমে যাবে।

আগামী দশকগুলোর চ্যালেঞ্জগুলোকে তিনটি মৌলিক নীতিতে সংক্ষেপে বলা যায়

১. মানব স্বাধীনতা ও মর্যাদার দার্শনিক ভিত্তিতে প্রত্যাবর্তন এবং এর রাজনৈতিক পরিণতি

২০শ শতাব্দীর দার্শনিক সঠিকতা এখন অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীনতা ও আপেক্ষিকতাবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। জীবনের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়ে মতামতের ব্যাপক বৈচিত্র্যের কারণে, এমনকি সাধারণ দৈনন্দিন রাজনৈতিক বিষয়গুলোও প্রায়ই বিশাল চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। এটি আজ মুক্ত বিশ্বের ভিত্তি অনুসন্ধানকে আরও বৃথা মনে করায়, কারণ এতে এমন দার্শনিক বা ধর্মতাত্ত্বিক দিক স্পর্শ করে যা কেউ সহ্য করতে পারে, কিন্তু অবশ্যই আলোচনা করা উচিত নয়। যেহেতু এই হতাশা অনিবার্যভাবে দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং এভাবে অর্থের সংকটে নিয়ে যায়, তাই এখান থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে।
ব্যক্তির মর্যাদা, যা সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সূচনা বিন্দু, অনিবার্যভাবে বাস্তবতার এক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিকে পূর্বধারণা করে। এই ভিত্তিকে—অন্তত এর কেন্দ্রীয় দিক ও পরিণতিতে—রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে এবং, কিছুটা হলেও, সেই জনগণের চেতনায় স্থাপন করতে হবে, যারা শেষ পর্যন্ত এর থেকেই তাদের অস্তিত্ব লাভ করে।

২. মুক্ত বিশ্বের সম্প্রদায়ের ভেতরের অনিশ্চয়তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভূ-কৌশলগত অভিমুখিতা এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা

উদার গণতন্ত্রগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই এমন ঝুঁকি থাকে যে কোনো দেশ *রাজনৈতিক* বা *সামরিক দিক থেকে* মুক্ত বিশ্বের জোট থেকে নিজেকে প্রত্যাহার

করতে পারে বা এটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। এই ধরনের ওঠাপড়াগুলো সব স্তরে পূর্বাভাস দিয়ে প্রতিরোধমূলকভাবে মোকাবিলা করতে হবে।
সার্বভৌম হিসেবে জনগণ যে কোনো সময় এমন ফলাফলের পক্ষে ভোট দিতে পারে যা বিদ্যমান মূল্যবোধের জোটকে দুর্বল করে। তবে *পৃথক গণতন্ত্রগুলোকে নিজেদের* বিলুপ্তির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানিকভাবে সুরক্ষিত রাখা উচিত। রাষ্ট্রগুলোর জোটের কাঠামোর মধ্যে আরও ব্যাপক সুরক্ষা থাকা আরও আকাঙ্ক্ষনীয়।
মূল্যবোধের জোট হিসেবে মুক্ত বিশ্বকে এমন এক নিরাপত্তা ঝুঁকির বিরুদ্ধে নিজেকে সজ্জিত করতে হবে, যা উদ্‌ভূত হবে যদি একক কোনো কেন্দ্রীয় বা একাধিক ছোট নিরাপত্তা নিশ্চয়ক অদৃশ্য হয়ে যায়। ভূ-কৌশলগতভাবে প্রাসঙ্গিক জাতীয় রিজার্ভের পাশাপাশি এর জন্য প্রয়োজন এমন এক নিরাপত্তা কাঠামো, যা যতটা সম্ভব স্থিতিস্থাপক, জাতীয় একক প্রচেষ্টার ঊর্ধ্বে এবং স্বৈরতান্ত্রিক নেটওয়ার্কের আক্রমণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিহত করার সক্ষমতা রাখে।

৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুক্ত বিশ্বের প্রতি ধারাবাহিক ও টেকসই প্রতিশ্রুতি, স্বাধীনতার ঐতিহাসিক বিজয়ের সচেতনতায়

পারস্পরিক নিরাপত্তার লক্ষ্য শুধুমাত্র *জাতীয় স্বার্থের* সংকীর্ণ অর্থে পৃথক রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা নয়, বরং স্বাধীন বিশ্বের ঐতিহাসিক অর্জনগুলি—যদি সম্ভব হয় কোনো প্রতিঘাত ছাড়াই—সংরক্ষণ করা এবং মৌলিক মানবাধিকারের সার্বজনীন দাবি বাস্তবায়ন করা। অতএব, বৈশ্বিক পশ্চিমের প্রতিরক্ষা শেষ পর্যন্ত সর্বদা নৈতিকভাবে ন্যায়সঙ্গত জাতীয় স্বার্থে।[32]
অতএব গ্লোবাল ওয়েস্টের রাষ্ট্রগুলোর উচিত তাদের নিজ নিজ দেশে মুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারিত ও সুরক্ষিত রাখা, যাতে অভাব-ত্রুটির কারণে স্বাধীনতার ধারণা কলঙ্কিত না হয়।
বৈদেশিকভাবে, তাদের স্বৈরতান্ত্রিক আদর্শের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রদর্শন করতে হবে। দার্শনিক স্তরে, স্বৈরতন্ত্রের অস্তিত্ব পরম[33] -এর প্রতি অবমাননা। তাদের শাসন ও তাদের অর্জন আপেক্ষিক, তাদের আদর্শ, যতদূর তা মূর্ত, একটি *নকল দর্শন* যার দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি পূর্বনির্ধারিত: এটি সম্পূর্ণ শূন্যতায় শেষ হবে। তাদের ক্ষমতাধারী নেতাদের সমস্ত গৌর্য একদিন সত্যের মুখোমুখি হয়ে ধূলিসাৎ হবে – তবে তাদের মধ্যে যারা পথ পরিবর্তনের সাহস দেখায়, তারা ব্যতিক্রম।

---

[32] মানবাধিকার ও মৌলিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কোনো নীতি ক্ষুধা, দুর্দশা ও অত্যাচারের প্রতি অন্ধ চোখ করতে পারে না, তেমনি এটি দাবি করতে পারে না যে দ্বন্দ্বগুলো 'জাতীয় স্বার্থের' আওতায় পড়ে না। তবে বাস্তবে কারো নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা কেমন হবে, তা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

[33] যে শাসনব্যবস্থাগুলো মৌলিক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকভ্রান্তির মধ্যে পড়ে, তাদের অবাস্তবিকতা বর্ণনা করার জন্য এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া কঠিন।

উল্লিখিত নীতিবাক্যগুলো কোনো ইউটোপীয় বা মৌলবাদী কর্মসূচি নয়, এবং এগুলো কূটনীতি, ভূ-কৌশল ও *বাস্তব রাজনীতিকে* প্রত্যাখ্যান করে না[34] । এগুলো প্রথমেই ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণাঙ্গ, আন্তরিক প্রত্যাবর্তন দাবি করে, এবং তারপর ২১তম শতাব্দীতে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠা অনিশ্চয়তাগুলোর বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানায়। চূড়ান্ত লক্ষ্য যে মানবাধিকারের সার্বজনীনতা—এবং আর কিছুই নয়— , সবার জন্য একটি মুক্ত বিশ্ব বা একটি *সার্বজনীন* পশ্চিমা—এটি গত তিনশো বছরের মানবাধিকার ঘোষণাসমূহের ক্ষেত্রে আর প্রশ্নাতীত হওয়া উচিত নয়।[35]

© ২০তম শতাব্দী গবেষণা প্রকল্প – বৈশ্বিক পশ্চিমের দর্শন

অতিরিক্ত তথ্য ও যোগাযোগ:

২০শতাব্দী গবেষণা প্রকল্প
www.20th-century.net

বিশ্বব্যাপী পশ্চিমের দর্শন
www.theglobalwest.com

✉ www.steff.international/CONTACT/

- সংস্করণ ১ / ২০২৬ -

[34] রিয়েলপলিটিক্স এখানে সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক চালবাজি হিসেবে ধরা হয়নি, বরং এটি একটি ব্যাপক রাজনৈতিক শৈলী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, যা বাস্তবতা—অতিমাত্রিক বিষয়গুলো সহ—এবং সেগুলোর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন।

[35] ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা মানবাধিকার মর্যাদার কথা বলে, আর এর আমেরিকান ও ফরাসি পূর্বসূরিরা অবিচ্ছেদ্য অধিকারের কথা বলে, উভয়ই একটি অ-পজিটিভিষ্ট ভিত্তি নির্দেশ করে।